বস্তুসার (ABSTRACT)

মানুষ যে সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় তার মধ্যে হাসি অন্যতম। আলঙ্কারিকেরা মানবচিত্তে যে নয়টি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে হাস্ ভাব একটি। এই হাস্ ভাব থেকেই হাসির জন্ম হয়। মানব সভ্যতার বিকাশের আদিস্তর থেকেই মানুষ হাসতে শিখেছে। সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় যেদিন থেকে সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও হাসি সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রথম অবস্থায় পৃথিবীর কোন দেশের সাহিত্যেই হাস্যরসের প্রবেশ অবাধ ছিল না। সাহিত্যগুরু অ্যারিষ্টটল হাসি রঙ্গব্যঙ্গকে খুব উঁচুতে স্থান দেননি। তিনি হাস্যরসকে নিম্ন রুচির প্রকাশ বলেই মনে করতেন। যদিও তিনি একে অস্বীকার করেননি। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যও শত শত ব্যঙ্গ রচনায় সমৃদ্ধ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র বড়াই, ‘চন্ডীমঙ্গলে’র ভাড়ুদত্ত অথবা মুরারী শীল হাস্যরসিক চরিত্র হিসেবে পাঠকের কাছে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। এ কথা ঠিক যে আধুনিক যুগের আগে পর্যন্ত হাস্যরস সাহিত্যের আসরে তেমন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক যুগ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আসরে হাস্যরস একটি বড় জায়গা অধিকার করে বসেছে। তবে এই হাস্যরস আদি ও মধ্যযুগের সাহিত্যের মত নয়। আধুনিক লেখকেরা হাস্যরসের ধারণায় একটি বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলেন। আধুনিক লেখকেরা প্রায় সকলেই মনে করেন উচ্চস্তরের হাস্যরস বিদ্রূপ বা আঘাত দিয়ে আত্মতৃপ্তি বা সাময়িক আনন্দলাভের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে না। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, দরদ, প্রীতি ও সহানুভূতির সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অসঙ্গতি নির্দেশ করেই হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন থেকে শুরু করে দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই হাস্যরসকে এভাবে দেখেছেন। বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তিন শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। তবে জীবনদৃষ্টি, উপস্থাপন কৌশল, শিল্পগত নৈপুণ্য সকলের একই রকম নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এর রকমফের হতে বাধ্য। এই পার্থক্যের জন্যই একই রসের কারবারি হয়েও প্রতিটি লেখক ভিন্ন মর্যাদার অধিকারি। বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তিন প্রধান শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একই হাস্যরসের কারবারি হয়েও কীভাবে স্বতন্ত্র আসনের অধিকারি তা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা এই গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য।

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণাকর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমে ভূমিকা তারপর রয়েছে পাঁচটি অধ্যায়। সবশেষে আছে উপসংহার। অধ্যায় বিন্যাসগুলি হল এইরকম :

ভূমিকা :

প্রথম আধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পে হাস্যরসের ধারা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পে হাস্যরস।

তৃতীয় অধ্যায় : রাজশেখর বসুর ছোটগল্পে হাস্যরস।

চতুর্থ অধ্যায় : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে হাস্যরস।

পঞ্চম অধ্যায় : ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদের হাস্যরসের তুলনামূলক পর্যালোচনা।

উপসংহার :

ভূমিকা অধ্যায়ে হাস্যরসের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও হাস্যরসের নানা বৈচিত্র্য বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা সাধারণ হাসি ও সাহিত্যিক হাসির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে যথাযথ ধারণা না থাকলে হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের অন্দরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই একদম প্রথমে ভূমিকা অংশেই এ বিষয়গুলি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পে হাস্যরসের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আলোচনা করা হয়েছে। কোন লেখকই তার পূর্ব ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে পথ চলতে পারেন না বা বলা ভালো সকল লেখককেই একটা ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে পথ চলতে হয়। প্রত্যেক লেখকের পথ স্বতন্ত্র হতে পারে কিন্তু সেই পথ চলাও শুরু করতে হয় পূর্ব নির্ধারিত পথ ধরেই। ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। তাই তাদের মানস ধর্ম, রচনাগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিকে জানতে হলে আগে জানতে হবে কোন ভিত্তি ভূমির উপর তাঁরা দাঁড়িয়ে। সেই উদ্দেশ্যেই বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারার একটি সামগ্রিক চিত্র এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ছিল মূলত: স্থূলতা বা ভাঁড়ামি মাত্র। অধিকাংশ সময়ে তা শ্লীলতার সীমা ছাঁড়িয়ে গেছে। মুকুন্দ চক্রবর্তী ও ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে যথার্থ হাস্যরস সৃস্টিকর্তা মধ্যযুগে বিরল। বাঙ্গালীর অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা, অধিক মাত্রায় দেবদেবীর চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সেভাবে জমাট

বাঁধতে পারেনি। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এলেন একদল নতুন সাহিত্যিক নতুন সৃষ্টির ডালি নিয়ে। তারা যে হাস্যরস সৃষ্টি করলেন পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট হাস্যরস থেকে তা অনেকটাই আলাদা। হাস্যরস সৃষ্টি করতে গেলে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আস্তিক্যবোধ ও যে একধরণের গভীর ও গম্ভীর জীবন দৃষ্টির প্রয়োজন বর্তমান সাহিত্যিকেরা সে গুণগুলি আয়ত্ত করে হাস্যরস প্রধান রচনা সৃষ্টিতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এই সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮), ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩),বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১৯), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৪) প্রমুখ। আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের আসরে এরাই হলেন প্রথম যুগের হাস্যরসের শিল্পী। এদের হাত ধরেই অধুনিক যুগের বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ভীত প্রস্তুত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) আবির্ভাব ঘটে গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই ছোটগল্প রচনার ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে অন্যান্য রসের পাশাপাশি হাস্যরসকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সংখ্যায় কম হলেও বাংলা ছোটগল্পে তিনি প্রথম হাস্যরসের গল্প লেখেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের ধারায় তিনিই হলেন প্রথম শিল্পী। তাঁর ‘ইচ্ছাপূরণ’, ‘মুক্তির উপায়’, ‘সম্পত্তি সমর্পণ’, ‘সমাপ্তি’, ‘অধ্যাপক’, ‘সে’, ‘গল্পসল্প’, ‘রাজটীকা’ ইত্যাদি গল্পগুলিকে কৌতুক রসের গল্প হিসেবে অভিহিত করা চলে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায় যে তাঁর গল্পের একটি প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে কৌতুকরস। এরপর একে একে বাংলা হাস্যরসের ছোটগল্পের ধারায় এলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-১৯৮৫), রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৬-১৯৩২), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৭-১৯৭৬), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬-১৯৮৭), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ গল্পকারেরা। সংক্ষেপে এইসমস্ত গল্পকারের হাস্যরসিক সত্তার সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথের (১৮৪৭-১৯১৯) জীবন সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁর ছোটগল্পে হাস্যরস কীভাবে আছে তা আলোচনা করা হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যরস সৃষ্টির মূলে ছিল তাঁর নিজেরই ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাল্য-যৌবনের দিনগুলি তাঁর

নিদারুণ দু:খ দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে, কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর এক ধরণের কৌতুক স্নিগ্ধ মমত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। জীবনের রূঢ়তা কঠোরতা তাঁর নিত্য সঙ্গী থাকলেও কৌতুকপ্রিয় করুণাদ্র মানসিকতার গুণে তাঁর চিত্ততল বিষতিক্ত হয়ে থাকেনি। মুখে হাসি ও চোখে করুণার অশ্রু নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি সাহিত্য কর্মে মনোনিবেশ করেছেন। সমকালীন রাজনীতি, ভন্ড স্বদেশীয়ানা, মানবিকতার অবক্ষয়, নারীত্বের অবমাননা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে এক হাতে তিনি ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন, অন্য হাতে তিনি করুণার প্রলেপ দিয়েছেন। ভারতবর্ষের মানুষের কল্যান সাধনে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনে বারবার তাঁর এই প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই। মানুষের কল্যান সাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। সমাজসচেতন এই লেখক সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম রচনা ‘কঙ্কাবতী’ ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়। এটি উপন্যাস জাতীয় রচনা। ত্রৈলোক্যনাথের মোট ছোটগল্প সংকলন চারটি - ‘ভূত ও মানুষ’(১৮৯৬), ‘মুক্তামালা’(১৯০১), ‘মজার গল্প’(১৯০৬), ও ‘ডমরু চরিত’(১৯২৩)। এই চারটি গল্পগ্রন্থে মোট ২৪টি গল্প আছে। এই গল্পগুলির সবকটিই কৌতুক রসাত্মক না হলেও বেশীরভাগই কৌতুক রসাত্মক। আলোচ্য অধ্যায়ে এই কৌতুকরসাত্মক গল্পগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁর হাস্যরসের ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাজশেখর বসু পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কর্মজীবনে রাজশেখর বসু একটি রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। অথচ সাহিত্য সৃষ্টিতেও ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের অধিকারি রাজশেখরের হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের এক বড় বিস্ময়। বুদ্ধির দীপ্তি ও কৌতুকরসে মন্ডিত পরশুরামের ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথকেও চমকিত করেছিল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড’ রচনা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাঙ্গালীর পারিবারিক সমাজে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে, সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি নতুনভাবে গড়ে উঠেছে, দুর্ভিক্ষের আগুনে সমস্ত বঙ্গদেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তখন পরশুরাম বাংলা ছোটগল্পে আবির্ভূত হলেন হাস্যরসের চাবুক নিয়ে। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সমালোচনা। সে সমালোচনা কখনো প্রকাশ পেয়েছে প্রবল ঘৃণামিশ্রিত ব্যঙ্গে, কখনো বা তীব্র তিক্ত নির্মম অট্টহাসিতে। এই অধ্যায়ে রয়েছে তারই বিস্তারিত আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায়ে পূর্বোক্ত দুটি অধ্যায়ের মত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭৯) জীবন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁর হাস্যরসের ছোটগল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পেশায় তিনি ছিলেন চিকিৎসক কিন্তু নেশায় তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। বনফুল ছদ্মনামে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। ছোট থেকেই বনফুলের স্বভাবে ব্যঙ্গপ্রবণ মানসিকতা সদা সক্রিয় থেকেছে। বস্তুত: ব্যঙ্গ কবি হিসেবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর 'জনপ্রিয় জনার্দন', 'শালা' ইত্যাদি কবিতাগুলি তীব্র ব্যঙ্গমূলক। সমাজের সমস্ত ভন্ড মানুষদের বনফুল বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন এই কবিতাগুলিতে। শুধু কবিতা নয় বনফুল ছোটগল্পের মধ্যেও ব্যঙ্গরসের ধারা প্রবাহিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পগুলির সিংহভাগ জুড়েই আছে রঙ্গব্যঙ্গের ছড়াছড়ি। 'অদ্বিতীয়া', 'পূজার গল্প', 'ক্যানভাসার', 'অলকানন্দা', 'যুগান্তর', 'দত্ত মহাশয়', 'দোলের দিনে', 'অপূর্ব বিজ্ঞান', 'বর্ণে বর্ণে', 'সেকালের রায় বাহাদুর', ইত্যাদি বহু গল্পে বনফুল সমাজ ও মানুষের বহু অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন। বনফুলের সংক্ষিপ্ত জীবন রচনার পাশাপাশি ব্যঙ্গরসিক গল্পকার হিসেবে বনফুলের ছোটগল্পগুলির পরিচয় রয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর ও বলাইচাঁদের হাস্যরসের তুলনামূলক পর্যালোচনা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এই তিনজন গল্পলেখকই হাস্যরসের শিল্পী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পে সমান জনপ্রিয়। এই তিনজন ছোটগল্পকারের একটি তুলনামূলক আলোচনা সূত্রে বাংলা হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের ধারায় এই তিনজন ছোটগল্পকারের মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। এই তিনজন শিল্পী তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়ার কারণে কীভাবে তাদের লেখক ব্যক্তিত্ব পরস্পরের থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে তার স্বরূপ বুঝবারও চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। কৌতুকরসকে নিয়ে তিনজনই কারবার করেছেন কিন্তু সময়ের ভিন্নতা, যুগের দাবি তাঁদের শিল্পী সত্তা, তাঁদের গল্পের বিষয় ও তাঁদের হাস্যরস সৃষ্টির ধরনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এরপর উপসংহার। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে হাস্যরসিক উঠে আসে তাঁর সময়ের গর্ভ থেকেই। সময় লেখককে হাস্যরসিক হয়ে উঠতে প্রেরণা দেয়। হাস্যরসিক তার হাস্যরসের

উপাদান সংগ্রহ করেন তাঁর নিজস্ব সময় থেকে। তাই সময়ের পরিবর্তনে হাস্যরসিকের বিষয় যেমন পরিবর্তিত হয় তেমনি তার অভিব্যক্তিতেও আসে বদল। তাই তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হওয়া তিনজন হাস্যরসাত্মক ছোটগল্পের শিল্পী একই রসের রসিক হয়েও বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনরীতির দিক থেকে তারা হন ভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন। তাদের রচনার স্বাদও হয় আলাদা। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—এই তিনজন হাস্যরসিক শিল্পীর ক্ষেত্রেও একথা সর্বাংশে সত্যি।